রোযা পার্কস : অনিবার্য আন্দোলনের অনিচ্ছুক প্রতীক

মুহম্মদ জুবায়ের

পঞ্চাশের দশকে আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের একটি প্রধান চরিত্র রোযা পার্কস-এর নাম খুব বেশি পরিচিত নয়। আজকের মাইকেল জ্যাকসন, মাইকেল জর্ডান বা ওপরা উইনফ্রি যেমন ঘরে ঘরে পরিচিতি নাম, রোযা পার্কস-এর পরিচিতি সে তুলনায় কিছুই নয়। অথচ একজন রোযা পার্কস বিহনে এই কৃষ্ণাঙ্গ তারকাদের আজকের পর্যায়ে আসা অসম্ভবই হতো। কিন্তু খ্যাতি তিনি চাননি, অনেকটা অনিচ্ছায় এবং ঘটনাক্রমে এই আন্দোলনের অনুঘটক ও প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন।

১৯৫৫ সালের ১ ডিসেম্বর, সন্ধ্যাকাল। অ্যালাবামা রাজ্যের মন্টগোমারি শহরে ক্লীভল্যান্ড অ্যাভিন্যুতে বাসে উঠেছেন ৪২ বছর বয়সী রোযা পার্কস। সারাদিনের কাজের শেষে ক্লান্ত শরীরে বাসে উঠে বসেছেন। মাঝের দিকের সারিতে বসা রোযার সঙ্গে আরো তিনজন কৃষ্ণাঙ্গ, দু'জন মহিলা ও একজন পুরুষ। বাসচালক একজন সাদা যাত্রীর জন্যে তাদের আসন ছেড়ে দিতে বলে। অন্য তিনজন উঠে গেলেও রোযা ঠায় বসে থাকেন। বাসচালক জিজ্ঞেস করে, 'কী হলো, তুমি উঠবে না?'

সংক্ষিপ্ত উত্তর আসে, 'না।'

'আমাকে তাহলে পুলিশে খবর দিতে হবে।'

'তা তুমি অনায়াসে করতে পারো।' রোযা পার্কস-এর নির্বিকার ও দৃঢ় জবাব।

পঞ্চাশের দশকের অ্যালাবামায় একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারীর পক্ষে এই অস্বীকৃতি অকল্পনীয়। মন্টগোমারি শহরের বাসযাত্রীদের ৭৫ ভাগ কৃষ্ণাঙ্গ, অথচ আইন অনুযায়ী পাশাপাশি বসা দূরে থাক, কালোরা প্রথম চারটি সারিতে তারা বসতে পারবে না, সেগুলি সংরক্ষিত থাকবে শুধুমাত্র সাদা চামড়ার মানুষদের জন্যে। প্রয়োজনে সাদারা মাঝের সারিগুলিরও দখল নিতে পারবে, তখন কালোরা আরো পেছনে সরে বসবে। বসার জায়গা না পেলে দাঁড়িয়ে থাকবে অথবা নেমে যাবে। শুধু তাই নয়, সাদারা সামনের সারিতে বসে থাকা অবস্থায় কালো যাত্রীরা সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে শুধুমাত্র টিকেট কেনার জন্যে। তারপর নেমে যেতে হবে এবং পেছনের দরজা দিয়ে তারা বাসে উঠবে, কিন্তু কোনোক্রমেই সাদা যাত্রীদের পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলবে না। কৃষ্ণাঙ্গ বাসযাত্রীরা ওই বৈষম্যমূলক আইনের প্রতিবাদ দীর্ঘকাল ধরে করেছে। রোযা পার্কসও ব্যতিক্রম ছিলেন না, 'ওই গ্রেফতারের ঘটনা থেকেই প্রতিবাদের সূচনা হয়নি, মন্টগোমারির রাস্তায় আমাকে অনেক হাঁটতে হয়েছে।'

মানবাধিকারের উচ্চকণ্ঠ ধ্বজাধারী আমেরিকায় এমন মানবেতর ব্যবস্থা মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও ছিলো, ভাবা যায়! সাদা-কালোর ভেদাভেদ আজও আমেরিকার সমাজ ও রাজনীতিতে একটি বড়ো বিষয়, কিন্তু তার চেহারা সেই সময়ের মতো অমানবিক নয়।

১৯৪৩-এ এক বাদানুবাদের জের ধরে চালক জেমস ব্লেক বাস থেকে নামিয়ে দিয়েছিলো রোযাকে। কাকতালীয় বললেও কম বলা হয়, ১৯৫৫-র ১ ডিসেম্বরে ক্লীভল্যান্ড অ্যাভিন্যুতে ইতিহাসের অংশ হয়ে যাওয়া ঘটনাটির সময়ও বাসের চালক ওই জেমস ব্লেক! সেদিন রোযা পার্কসকে গ্রেফতার করা হয় পৃথকীকরণ (সেগ্রিগেশন) আইন ভঙ্গের দায়ে। এর প্রতিক্রিয়ায় সিভিল রাইটস আন্দোলন সংগঠিত হয়, নেতৃত্বে চলে আসেন যুবক মার্টিন লুথার কিং, যাঁকে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিতে হয় ১৯৬৮ সালে।

রোযা পার্কস-এর গ্রেফতারের দিনটি ছিলো বৃহস্পতিবার। প্রতিবাদে পরের সোমবারে মন্টগোমারির কৃষ্ণাঙ্গরা বাসে আরোহন বন্ধ করে দেয়। তারা কাজে যায় গাড়িতে আসন ভাগাভাগি করে অথবা কৃষ্ণাঙ্গ মালিকানার ট্যাক্সিতে করে। এই ট্যাক্সিচালকরা সেদিন বাসভাড়ার সমান দশ সেন্ট ভাড়ায় যাত্রীবহন করে। প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ পায়ে হেঁটে কাজে যাতায়াত করে, অনেককে হাঁটতে হয় বিশ মাইলেরও বেশি পথ। দীর্ঘ তেরো মাস মন্টগোমারির বাস সার্ভিস বয়কট করেছিলো তারা। অবশেষে সুপ্রীম কোর্ট বাসে কৃষ্ণাঙ্গদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করার আইন রদ করে। তারিখ ১৯৫৬ সালের ১৩ নভেম্বর। নাগরিক অধিকার আন্দোলন নতুন গতি পায়, যার ফলশ্রুতিতে কয়েক বছরের মধ্যে মানুষ ও নাগরিক হিসেবে কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার স্বীকৃতিলাভ করে।

সেদিনের রোযা-র অনুচ্চকিত প্রতিবাদ তাঁকে ক্রমে বর্ণবাদ রহিতকরণ আন্দোলনের অনিচ্ছুক প্রতীক-চরিত্রে পরিণত করে। ১৯৮৮ সালে এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন, ‘সিভিল রাইটস আন্দোলনের মাতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার কোনো আকাঙ্ক্ষাই আমার ছিলো না। ...আসলে ছক কেটে হিসেব কষে গ্রেফতার হওয়ার উপায় আমার ছিলো না। ...আমি সেদিন গ্রেফতার হবো বলে বাসে উঠিনি, উঠেছিলাম বাড়ি ফেরার জন্যে। সারাদিন কাজের শেষে ক্লান্তি ছিলো, তবে তা অন্যসব দিনের চেয়ে বেশি কিছু নয়।’

তাঁর নিজের ভাষ্যে জানা যাচ্ছে, কালো রঙের মানুষরা সম্পূর্ণ মানুষ নয় – এই ধরনের আদিম ধারণা ও নিয়মে ক্রমাগত অপমান সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। নিয়মগুলির কিছু ছিলো লিখিত আইন আর কিছু বাহিত হয়ে আসা অভ্যাসের ফল। কিন্তু জীবনে একটা সময় আসে যখন প্রতিবাদ করতেই হয়। তাই তাঁকে বলতে হয়েছিলো, ‘আমিও একজন পূর্ণ মানুষ ও নাগরিক। এই নিগ্রহ আমার প্রাপ্য নয়’।

মার্টিন লুথার কিং তাঁর ‘স্ট্রাইড টু ফ্রীডম’ বইয়ে লিখেছেন, “মিসেস পার্কস-এর এই প্রতিবাদ কেউ বুঝবে না যতোক্ষণ না এই অনুভব আসে যে একসময় সহনশীলতার পাত্রটি উছলে ছলকে পড়ে এবং মানবিক ব্যক্তিত্বটি এই বলে চিৎকার করে ওঠে, ‘আমার আর সহ্য হয় না’।”

কৃষ্ণাঙ্গ নেতা জেসি জ্যাকসন বলেন, ‘তিনি সেদিন বসেছিলেন বলে আমরা উঠে দাঁড়াতে পেরেছিলাম। তিনি অন্তরীণ হয়ে আমাদের মুক্ত করেছিলেন।’

পরে তিনি মিশিগ্যান রাজ্যের ডেট্রয়ট শহরে চলে যান এবং ১৯৬৫ সালে কংগ্রেসম্যান জন কনিয়ারস রোযাকে তাঁর কংগ্রেশনাল অফিসের কর্মী হিসেবে নিযোগ করার আগে পর্যন্ত সীমস্ট্রেস হিসেবে কাজ করেন। ১৯৮৮ সালে অবসর নেন রোযা। মৃত্যু ২১ অক্টোবর ২০০৫।

নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সূচনা থেকেই কৃষ্ণাঙ্গরা তাঁকে প্রায় দেবী-প্রতিমা হিসেবে দেখতে শুরু করলে রোযা অস্বস্তি বোধ করতেন। বলতেন, ‘আমি শুধু আশা করেছি যুবা বয়সীদের কিছু উদ্বুদ্ধ করতে, আর কিছু নয়। আমি এমন একজন মানুষ যে সকল মানুষের স্বাধীনতা, সমতা, সুবিচার ও সমৃদ্ধির প্রত্যাশী – এটুকুই আমার পরিচয় হোক।” রোযা পার্কস-এর চরিত্রের যে দিকটি সবচেয়ে

আকর্ষক মনে হয় তা তাঁর অবিস্মরণীয় বিনয় ও সরলভাবে সত্য বিবৃত করা। নিজের পাতে ঝোল টানার আগ্রহ তাঁর নেই, নিজেকে অসাধারণ প্রতিপন্ন করতেও আগ্রহী নন। নিতান্ত অনিচ্ছুক এই নারীর মতো গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হলে আমাদের নেতানেত্রীরা কী বলতেন ভাবতে ভয় হয়।

কয়েক বছর আগে তাঁর জীবদ্দশাতেই একটি আগ্রহোদ্দীপক ঘটনা ঘটে। মিজৌরি রাজ্যের সেন্ট লুইস শহরে হাইওয়ের কয়েক মাইলব্যাপী একটি অংশ, যার নাম রোযা পার্কস হাইওয়ে, তার রক্ষণাবেক্ষণের (আমেরিকায় 'অ্যাডপ্ট আ হাইওয়ে' প্রকল্পে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন হাইওয়ের নির্দিষ্ট অংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব নিয়ে থাকে) দায়িত্ব পায় কু ক্ল্যাক্স ক্ল্যান নামের কুখ্যাত বর্ণবাদী সংগঠনটি। নিয়তির পরিহাস বোধহয় একেই বলে। যে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রতীক চরিত্র তিনি হয়ে উঠেছিলেন, সেই বর্ণবাদের প্রবক্তা সংগঠনের ওপর রোযা পার্কস হাইওয়ের দেখাশোনার ভার!

এই ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন মহলে কিছু আলোচনা হচ্ছিলো, সেই সময়ে এই রচনাটি আমার লেখার ইচ্ছে ছিলো। হয়ে ওঠেনি। এর মধ্যে তাঁর মৃত্যুও হয়েছে। লিখতে এই বিলম্বে ক্ষতি কিছু অবশ্য হয়নি। রচনাটি রোযা পার্কসকে উদ্দেশ করে নয়, তাঁকে নিয়ে লেখা।

ফেব্রুয়ারি ২০০৬

email : mz1971@gmail.com